International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.97-107
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.97-107

নলিনী বেরার 'ভাসান' উপন্যাসে সময়ের দলিলীকরণ

পাপিয়া খাঁ

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

If we were to describe the first part of the twentieth century as a tumultuous period in the history of Bengali and the Bengali people, then the post-independence era would be characterized by pessimism and shattered hopes. The events of the 1970s also failed to provide any new assurances in the consciousness of the time. However, with the dreams of change, the intent of surrounding the city with the village and the attempt of implementation much has been changed in society, fundamentally changing the focus of literature as well. Since this time rual life gained importance in literature as well as politics. However, Nalini Bera had envisioned much more than mere dreams of change. He had woven a tapestry of transformation, not only altering the literary landscape but also transcending the core essence of literature. Literature had expanded beyond the confines of politics to embrace the boundless canvas of rural life. Post-independence writers, with their diverse literary creations, had detached themselves from the mainstream literary current and marked their independence. Among these literary luminaries, Nalini Bera stood out prominently. Born on July 20, 1952, in the vicinity of 'Subornorekha' riverbanks near the border of West Bengal, Odisha, and Bihar, in the village of 'Bachur Khnoar', he hailed from an ordinary farming family. During the latter half of the twentieth century, his birth coincided with significant events, and each occurrence left an indelible impact on his literary present. His compositions emerged as a rich tapestry of diversity and relevance. Through his literary works, he captured the essence of each transformative moment. His keen eyes and ever-attuned mind remained companions of the times. In his writing, the interplay of time and society became multifaceted and contextually rich. His literature seemed to encapsulate a trustworthy image of every passing era. Consequently, his literary work became a significant facet of temporal awareness. Nalini Bera's vigilant gaze and his mind perpetually engaged with the zeitgeist. Alongside time, he was intricately connected to people and their metamorphosis. The novel 'Bhasan' exemplifies how contemporary realities found expression in his literary work.

দেশ-কালকে দূরে সরিয়ে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে রচিত কোনো সাহিত্যই দেশ-কালকে অস্বীকার করতে পারেনা। গুঢ় ধর্মচর্চা থেকে

দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন সকল সাহিত্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ-কালের ছায়াপাত ঘটে। আধুনিক যুগের সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যের সব থেকে বড় উপাদান হল সময়। সাহিত্য সময়ের যুগ চিহ্নগুলিকে ধারণ করতে করতে অগ্রসর হয়। জীবনে চলার পথে সময় প্রতিনিয়ত প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চলে প্রতিটি শিল্পমাধ্যম। সময়ের মাত্রাকে ধারণ করতে করতে বদলে যেতে থাকে বিষয়বস্তু। প্রত্যেক সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে সময় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি স্রষ্টার মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এর মধ্য থেকেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আবার একটি নির্দিষ্ট সময়-পরিধিতে থেকেও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে ব্যক্তির সাহিত্য-ভাবনা পৃথক হয়ে যায়। তাই স্রষ্টাভেদে সৃষ্টিও ভিন্নতা পায়। কারণ সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা মিশিয়ে দেন আপন মনন, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং কল্পনা-মাধুরী। তাই এই সৃষ্ট-সম্ভারের মধ্যে লক্ষ করা যায় বহুমাত্রিকতা। ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা যে সময় ও সমাজ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যগুলিকে সেই সময় ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। নলিনী বেরার জন্ম ১৯৫২ সালে, পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশার সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা নদীতীরের বাছুরখোঁয়াড় গ্রামে। অর্থাৎ স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে। আর তাঁর লেখালিখি শুরু সত্তরের দশকে। স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে বা পরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সময়ের উত্তাপকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও নলিনী বেরা 'কালেক্টিভ মেমোরির' শরিক। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখায় দেশ-কাল এক অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের জনগণ যে স্বাধীনতা লাভ করল তার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ অধরাই থেকে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতায় আনন্দোচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ না ঘটাই স্বাভাবিক। সে সময় অনেকের মনে হয়েছে ইয়ে আজাদী ঝুঠা হ্যায়। দিনে দিনে শোষণ বেড়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নতুন কোনো দিগন্তের সন্ধান দিতে পারেনি। অজস্র উন্নয়নমূলক কর্মসূচীও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারেনি, উৎপাদনবৃদ্ধির শ্লথগতিকে ত্বরান্বিতকরতে পারেনি। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের মোহভঙ্গ ঘটে। স্বাধীনতার নামে কেবল শাসক বদল হয়। মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলত শাসক আর শোষিতদের দ্বন্দ্ব ক্রমশ ঘনীভূত হয়। যাকে আরও ত্বরান্বিত করে স্বাধীনতা পরবর্তী খাদ্যাভাব, উদ্বাস্তু সমস্যা, কালোবাজারি ব্যবস্থা। অবহেলিত, অনাহার কবলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষগুলোর ক্ষোভ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধরূপ লাভ করে, এবং তা তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই সকল আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তেভাগা আন্দোলন ছিল উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ জোতদারকে দিয়ে বাকি দুই ভাগ নিজেরা রাখবার দাবিতে বর্গাদারদের আন্দোলন। এই আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের যুগসন্ধিক্ষণে। একই সঙ্গে এটি ছিল বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামের সচেতন ও সংগঠিত বিদ্রোহের প্রথম প্রয়াস। এই সময়েই "১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যায়ে বন্যা, মড়ক ও সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ ('পঞ্চাশের মন্বন্তর') একের-পর-এক নেমে আসে বাংলার বুকে-যার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব কৃষকেরা, বিশেষত বর্গাদাররা। তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিশেষত মফস্‌সল শহর ও গ্রামগুলিতে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য ব্যাপক রিলিফ ওয়ার্ক সংগঠিত হয়।"[১] এর মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সাধারণ গরিব মানুষদের সংযোগ আরও

সুদৃঢ় হয়। যার ফলস্বরূপ ১৯৪৬ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭ এর জানুয়ারির মধ্যে অবিভক্ত বাংলার উনিশটি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু "...কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাদের মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতা, জঙ্গি কৃষক সংগ্রামের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপারে দুর্বলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতার জন্য এবং সর্বোপরি তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত ভ্রান্ত লাইনের কারণে এই প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় কৃষক বিদ্রোহকে তার স্বভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।"[২] তেভাগা ব্যর্থ হলেও তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ সফলতার মুখ দেখেছিল। তাই ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে তেলেঙ্গানা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। তেলেঙ্গানার সাফল্য সাধারণ মানুষকে আরও বিপ্লবমুখী করে তুলেছিল। এই সময়পর্বে সংগ্রামের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রতিবাদের এক বীভৎসরূপ নিয়ে প্রকট হয়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জোতদারদের একচেটিয়া জমির মালিকানা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে উদ্বৃত্ত জমি দখল করা। এছাড়াও গ্রামের বিত্তধারী এবং প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের অহংকে চূর্ণ করা। কিন্তু কেবল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের প্রতিটি প্রকোষ্ঠেই এই আন্দোলন সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলনের আবেদনে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল বৃহত্তর কৃষকসমাজ ও শহরের মধ্যশ্রেণি। স্কুল কলেজের ছাত্ররা, শহরের যুবকেরা সমকালীন সামাজিক হতাশা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নকশালবাড়ির সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে তরাই অঞ্চলে দার্জিলিং জেলার তিনটি থানা নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি এলাকায়। ধীরেধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। কারণ শোষণের চালচিত্র সমগ্র রাজ্য জুড়েই ছিল প্রায় একইরকম। কৃষিই যে দেশের মূল ভিত্তি সেখানে সবথেকে বেশি বঞ্চিত লাঞ্ছিত হয়েছে কৃষকরাই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও সেই সংকট মেটেনি। বরং আরও ঘনীভূত হয়েছে। "মধ্যস্বত্ব ও জমিদারী বিলোপ, খাজনা নির্দিষ্টকরণ, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, কৃষিঋণ কাঠামোর সংস্কার, সমবায় খামার গঠন ইত্যাদি কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করবার আইনী ব্যবস্থাগুলি ভারতের কৃষি-কাঠামোর কোন মৌলিক সংস্কার ঘটাতে পারেনি; কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনে এদের ভূমিকা নিতান্তই নগন্য বলে পরিগণিত হয়েছে; আর সেই সঙ্গে সংকট তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। জমির জন্য ক্ষুধা বেড়েছে। ভূ-স্বামী মহাজন, জোতদার প্রমুখেরা একযোগে কৃষি সংস্কারের প্রতিটি প্রয়াসকে প্রহসনে পরিণত করেছে।"[৩] ফলত দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। কংগ্রেসের দীর্ঘ রাজত্বে প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে রয়ে গেছিল বিস্তর ফারাক। গ্রামের উন্নয়ন যেমন সে ভাবে দেখা যায়নি, ঠিক সেভাবেই শহরে একদিকে যেমন বহুতল বাড়ি নির্মিত হয়েছে, বিলাস উপকরণের প্রাচুর্য বেড়েছে অপর দিকে বেকারের সংখ্যা ও দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থিত মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পোন্নয় না হওয়ায় বঞ্চিত হয়েছে শ্রমিকরা। ফলত, "পশ্চিম বাংলার রাজনীতি-সচেতন, বিশেষত শহুরে, মানুষেরা ক্রমেই এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে আরম্ভ করে যে, লাল রাস্তাই সমাজ রূপান্তরের রাস্তা, মানুষের মানসিকতায় উত্তরণের রাস্তা। কিন্তু সে রাস্তা সহজও নয়; মসৃণও নয়।...জাতীয় সংহতি ও স্থিতাবস্তার কেন্দ্রবিন্দু কংগ্রেসকে হারাতে না পারলে লাল রাস্তা নির্মাণের কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে না।"[৪] সেই সুযোগ আসে ১৯৬৭ সালে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সংগঠনে ভাঙন শুরু হয়ে গেছিল। ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অজয় মুখার্জীকে অপসারিত করা হলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে 'বাংলার কংগ্রেস' নামে নতুন একটি দল গঠন করেন। 'বাংলা

কংগ্রেস' ও সি-পি-আই সমঝোতার ভিত্তিতে ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। "এই নির্বাচনে সি.পি.এম এর অনেকখানি সাফল্যের কারণ হল কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন, বর্গাস্বত্ব, খাদ্য, কাজ, মজুরী ইত্যাদি নিয়ে কৃষক সভার মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলন। এ সময়ে আন্দোলন শুধু যে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়। কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনারও এ সময় যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল এবং তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও ক্ষমতা দখলের জন্যও সংগঠিত হতে শুরু করেছিলেন।"[৫] প্রাথমিকভাবে সফলতা অর্জন করলেও এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক সন্ত্রাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জোতদার ও প্রভাবশালীদের 'খতম' করার যে নীতি শুরু হয় তা উত্তরোত্তর হত্যালীলায় পরিণত হয়। নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও খুব তাড়াতাড়ি এই আন্দোলনের আগুন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা বিহার, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কারণ শাসক আর শোষিতদের অবস্থানের চিত্রটা সমগ্র দেশে ছিল একই রকম। শ্রমিক এবং কৃষকেরা সবসময় শোষিত এবং বঞ্চিত হয়েছে। ফলে খুব দ্রুততার সঙ্গে এই আন্দোলনের জোয়ার বাংলা তথা বাংলার বাইরেও বহু অঞ্চলকে প্লাবিত করে। গোটা দেশ শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সেই সময়। প্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা-পুলিশি অভিযান এবং অত্যাচার আন্দোলনকে অনেকটা গতিহীন করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নকশাল আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং শুধু তাই নয় এই আন্দোলন এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

নকশাল আন্দোলন কতখানি সফলতা অর্জন করেছিল বা কতটা ব্যর্থ হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য থাকলেও নকশাল আন্দোলন জনজীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। সমাজের সকল স্তরেই তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতদিন ধরে অন্ধকারে থাকা গ্রামগুলিতে আলোর আভা এসে পড়েছিল। গ্রাম শহরের ব্যবধান অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল। গ্রামের প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামের দিকে পাড়ি দিল। গ্রামকে নিয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে অসীম উৎসাহ দেখা দিল। সর্বোপরি প্রশাসনের সজাগদৃষ্টি গ্রামের প্রতি নিবদ্ধ হল। বিভিন্ন যোজনা, পরিকল্পনায় গ্রাম গুরুত্ব লাভ করতে থাকল। নকশাল আন্দোলন যেমন সামাজিক পরিকাঠামো-শাসন ব্যবস্থার মর্মমূলে আঘাত করেছিল ঠিক তেমনি সাহিত্যের জগতেও এই আন্দোলন চরম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নকশাল আন্দোলন এক নতুন সাহিত্য গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল। যাঁরা বিকল্প গদ্য-আখ্যানের ভাবনা নিয়ে কথাসাহিত্যর জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকেই তার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু নকশাল আন্দোলন সাহিত্যিকদের চিন্তা চেতনার জগতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। শিল্পী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এই আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের যে সূচনা হয়েছিল তা ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যানুসারী। সেখানে সমাজের অভিজাত শ্রেণির প্রাধান্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজের উচ্চবিত্তদের কথাই উঠে আসে বেশি করে। কল্লোলীয়রা উচ্চমধ্যবিত্তের জীবন থেকে নিম্নমধ্যবিত্তের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে বাস্তবতার খোঁজ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রিয়ালিটির কারি পাউডর' মাত্র। কিন্তু সত্তর পরবর্তী সময়ে সাহিত্যর জগতে এক নতুন লেখক গোষ্ঠীর আগমন ঘটল যাঁদের রচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গ্রাম ও অন্ত্যজ জীবনের খুঁটিনাটি। যদিও এদের পূর্বে তারাশঙ্কর বা সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসে গ্রামীণ অন্ত্যজ জীবনের চালচিত্র নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সত্তর পরবর্তী লেখকরা যাপিত জীবন ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই সাহিত্যের রূপ দিতে চেয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে বাস্তবতার চরমতম রূপটি উঠে আসতে শুরু করল। আমাদের আলোচ্য কথাকার নলিনী বেরা সত্তর পরবর্তী লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে পড়াকালীন সময়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। সেখানে তিনি যে মেস বাড়িতে থাকতেন সেখানেই চলত আন্দোলনকারীদের গোপন মিটিং। নতুন দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। যাঁর সাহিত্য জীবনে প্রবেশের কাল ছিল এক উত্তাল সময়। নকশালবাড়ি আন্দোলনে যার সূত্রপাত, তার পরিণতি বিশ্বায়নে। এই সময় পর্বের সকল বিষয়ই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, কোথাও মূল বিষয়রূপে কোথাও বা পরোক্ষে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা নলিনী বেরা রচিত 'ভাসান' উপন্যাসটির নিবিড় পাঠের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করেছি কীভাবে কথাকার নলিনী বেরা সমসাময়িকতাকে আত্মস্থ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে পড়াশোনার সময়ে নলিনী বেরা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন একথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের কারণে সমকালীন দেশকালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গভীর নিবিড়। ফলত নকশাল আন্দোলন ও সমসাময়িক কাল তাঁর লেখার মধ্যেও নানাভাবে ধরা দিয়েছে। 'ভাসান' এমনই একটি উপন্যাস যেখানে নকশাল আন্দোলন ও সমসাময়িক সময়ের কথা বিধৃত হয়ে আছে। আলোচ্য গ্রন্থে নলিনী বেরা তাঁর জন্মস্থান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নকশাল আন্দোলন কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং জনজীবনে তার কী প্রভাব পড়েছিল তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। 'ভাসান' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। নকশাল আন্দোলনের পরের দশকে রচিত এই উপন্যাসটি খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠে এক বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞান। উপন্যাসটির প্রেক্ষিত নকশাল আন্দোলন, কিন্তু এই আন্দোলনের নামোল্লেখ না করেও আন্দোলনের অভিঘাতগুলিকে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক। রচনা করেছেন এক বিশেষ সময়ের ধারাবিবরণী। 'দেশ' ও 'কাল' এর দ্বান্দ্বিকতায় উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে চলে। সেই দ্বন্দ্বময়তায় লেখক-মননের পরিচয়টিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'ভাসান' উপন্যাসটিতে এক দীর্ঘ কালপর্বকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দূর অতীত থেকে নিকট বর্তমান উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে ধরা দিয়েছে। উপন্যাসটি কথক মণিময়ের দৃষ্টিতে দেখা। কথকের শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণ এবং তার বিবরণ খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিধৃত করা হয়েছে। এবং সেই বিবর্তনকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে সময়ের অভিঘাতগুলি। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে হদহদি গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারের দৈনন্দিন জীবন যাপনের গল্প দিয়ে। উপন্যাসের সময় যত এগিয়েছে উপন্যাসে তত তার পট পরিবর্তন ঘটেছে। এক একটা ঘটনা কথক মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে গেছে। উপন্যাসের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কথকের পিতৃবিয়োগ। বাবার মৃত্যুতে ছোট্ট-ভীত মণিময়কে সাহসী হতে দেখা যায়। পারিবারিক বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি পেতে সে ছুটে গেছে উন্মুক্ত প্রান্তরে, নদীর চরে, জঙ্গলের গভীরে। এছাড়াও তাঁর ভালোলাগার আশ্রয় ছিল ভুবনজেঠা ও তার মেয়ে স্বর্ণর সাহচর্য। এদের আবর্তেই কেটে যায় কথকের শৈশব থেকে কৈশোরের দিনগুলো। শৈশবে ভুবনজেঠা তার খেলার সঙ্গী, যার কাঁধে চড়ে অনায়াসে হদহদি থেকে বামুনপোতা যাতায়াত করা যায়। ভুবনজেঠাই হয়ে ওঠে তার পথপ্রদর্শক। ভুবনের দর্শনচিন্তা কথকমনকে খানিকটা গড়েও দেয়। ভুবনজেঠার মৃত্যু কথককে অসহায় একাকী করে দেয়। স্বর্ণ আর কথকের সম্পর্ককে কোনো সামাজিক মানদণ্ডে ফেলা যায় না। উভয়ে

উভয়ের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। জীবনের অপ্রাপ্তিগুলো বিধবা স্বর্ণকে মেজাজি বদরাগী করে তোলে। কিন্তু বাবার সংসারে বিরক্ত স্বর্ণর মুখে হাসি ফোটে বর্ষা এলে। কারণ বর্ষায় বাঁধ ভাঙলে সরকারি অফিসাররা আসবে বাঁধ নির্মাণের কাজ দেখতে। যাদের মধ্যে একজন হল হরিহর। এই হরিহর স্বর্ণর ভালোবাসার মানুষ যাকে আঁকড়ে ধরে স্বর্ণ নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। হরিহরকে কাছে পেতে সে ছুটে যায় মামার বাড়ি 'বাবুইচাটি' গ্রামে, যেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছিল। হরিহর স্বর্ণকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখায় কেবল তাকে ভোগ করতে। হরিহরের কাছে নারী শরীর কেবল ভোগ্যবস্তু মাত্র। হরিহরের মধ্যে দিয়ে কথক শোষক শ্রেণির একটা অবয়ব নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তার কাছে রান্ধুনী কেষ্টর বউ আর স্বর্ণর মধ্যে কোনো ফারাক নেই। স্বর্ণও সে কথা বুঝতে পারে। তাই গর্ভবতী স্বর্ণকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। স্বর্ণকে ফিরিয়ে আনতে মণিময় অর্থাৎ কথকও 'বাবুইচাটি' গ্রামে পৌঁছে যায়। সেখানে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলে। কিছুদিনের জন্য রিলিফ বাঁধে সুপারভাইজারির কাজ করেন কথক সেখানে। আর সেই কাজের সূত্র ধরেই উপন্যাসে উঠে আসতে শুরু করে সরকারি অফিসার তথা বড় ব্যবসায়ীদের অসততা ও দুর্নীতিগ্রস্ততার দিকগুলি। সত্তর দশক ও সেই সময় পর্বের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালবাজারি প্রভৃতি বিষয়গুলো উপন্যাসে উঠে আসে, সেই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও। পড়াশোনা না জানা সন্নদির মুখে আমরা শুনতে পাই "খেঁদিপেঁচি নাকবুঁচি তর সবার জন্যি যদি গভরমেট তাহলে ইনতার লোক না খেতে পেয়ে মচ্চে যে, তার বেলায় কি বলবি?"[৬] দেশের দুরবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে মানুষের 'মৌলিক চাহিদা' পূরণেও অক্ষম সরকার। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ যে ঘুরে দাঁড়াবেই এটাই স্বাভাবিক। সেই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পও নলিনী বেরা আমাদের এই উপন্যাসে শুনিয়েছেন। বাঁধের কাজে সুপারভাইজার হওয়ার দরুন সমাজের নিচুস্তরের মানুষদের জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছে মনিময়, আর মনিময়ের চোখ দিয়ে দেখেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে উঠে এসেছে সনা মুর্মু, ধনা মুর্মু, মঙ্গঁল সোরেন, গুরাবুড়া প্রভৃতি চরিত্রগুলি। যারা বাঁধে মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত। রিলিফ বাঁধে মাটি কাটার জন্য চৌকা পিছু দুই সের গম ধার্য ছিল কিন্তু সেটাও মজুররা পেত না। বঞ্চিত হতে হতে তারা সচেতন হতে শিখেছে। দেশব্রতীর কাজে ঝাপিয়ে পড়া শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক না দেওয়ায় তাদের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে তাকে সেই সময়ের দৈশিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খুব সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায়। শ্রমিকদের মধ্যে এই অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবকেই নির্দেশিত করে। নকশাল আন্দোলন যে কেবল ঐ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার জোয়ার গ্রাম বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এই ঘটনাটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঞ্চিত হতে হতে এই সাধারণ মানুষগুলো সচেতন হতে শিখেছে। সচেতনতা এসেছে নিজেদের পারিশ্রমিক বুঝে নিতেও। রিলিফ বাঁধের শ্রমিক সনা মুর্মু কথককে প্রশ্ন করে-

> "মুনিবাবুত গবরমেটের লোক.... বেশ বেশ...গবরমেটের কাজকাম
> কর তুমি, হঁ কি লাই বল?...মাগনা করকি, দুপয়সা পাও
> লিশ্চয়?...তুমার পুসাচ্ছে তুমি কাম কর, না পুসালে কত্তে?
> বল?"[৭]

উচ্চবিত্তরা কখনোই নিম্নবিত্তদের তাদের ন্যায্য মূল্য দিতে চায় না। সর্বদা শোষণ করতে চায়। অবদামিত হতে হতে প্রতিবাদের ভাষাটাও এবার নিম্নবিত্তরা আয়ত্ত করতে পেরেছে। সামান্য গমের দাবি তাদের। দেশে আকাল, বাজারে চাল অমিল। শ্রমের বিনিময়ে সামান্য গম পায় তারা, যা দিয়ে ক্ষুধানিবৃত্তিও হয়না

তাদের। সে কারণেই তাদের আন্দোলন। শ্রমিকদের এভাবে একত্রিত করা এবং তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইকে নেতৃত্ব দিয়েছে বামপন্থায় বিশ্বাসী সত্য ও বাঙ্গাল ডাক্তারের মেয়ে শিখা যারা বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে ঘর ছেড়েছিল। কেবল সত্য বা শিখা নয় এরকম অগণিত যুবক যুবতীরা দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে নকশাল আন্দোলনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে ঘর পরিবার ছেড়েছিল কেবল দেশের মানুষের পাশে থাকার জন্য। সত্যকে আমরা উপন্যাসে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। তার দলের নির্দেশে সে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করেছে, সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল যতদিন না তাদের দাবি মানা হবে ততদিন কাজকাম সব বন্ধ থাকবে। তাই-

> "গুদাম খালি, মানুষজন নেই, ফাঁকা ফৈ-ফিক্কির, আর থাকবেই বা কোত্থেকে? কাজকাম নেই, কুলিকামুনরা কাজ বন্ধ দিয়েছে, রিলিফবাঁধে এখন লালঝণ্ডা উড়ে, উড়ে ফত্‌ফত্।"[৮]

নলিনী বেরা তাঁর উপন্যাসে এমন এক সময়ের কথা বলেন যেখানে লালা পতাকাই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। লাল পতাকার ছত্র ছায়ায় অগণিত সাধারণ মানুষ তাদের কণ্ঠ ফিরে পেয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস পেয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রতি কোনো সদ্ভাব দেখা যায় না। উপরন্তু শ্রমিকদের বঞ্চিত করতেই তারা আগ্রহী। উপন্যাসটির মধ্যেও সেই উদাহরণ নানা স্থানে বিদ্যমান। উপন্যাসে আমরা দেখি বি.ডি.ও সাহেব শ্রমিকদের দাবি মানতে নারাজ। এবং সেই সুযোগে গুদামে কুলুপ এঁটে সতীস কাপাড়ি অবসর নিচ্ছে। কারণ তাকে আর কুলিকামিনদের মেপে জোকে গম দিতে হবে না। সতীস কাপাড়ির অবসর যাপনের সঙ্গী হয়েছে গোবিন্দমাস্টার, যতীন দলুই আর হরিহর। গোবিন্দমাস্টার মনে করে শ্রমিকদের চাট্টি গমের দাবি না মানার মতো এমন কিছু না। কিন্তু সতীস কাপাড়ির মতে--- "দাবি মানাটা বাহাদুরি নয়, বাহাদুরি হল না-মানাটা, চাপে পড়ে দাবি মেনেছ কি ওরা তোমাকে আরও পেয়ে বসবে।"[৯] কথকও পৌঁছে যায় তাদের আড্ডায় শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার আর্জি নিয়ে। একই ভাবে সে গেছিল শ্রমিকদের কাছে কাজ বন্ধ না করার অনুরোধ নিয়ে। সত্যকে বুঝিয়ে ছিল শ্রমিকদের উস্কানি না দিতে, কারণ কাজ বন্ধ থাকলে শ্রমিকরাই না খেতে পেয়ে মরে যাবে, মালিক পক্ষের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু কোনো পক্ষই তার কথাকে গুরুত্ব দেয়নি। সত্য তখন দলের সংকল্পে ব্রতী। শ্রমিকদের একত্রিত করে অন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্য বিশ্বাস করে এভাবেই সমাজ পালটাবে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তার মোহভঙ্গ হয়। মালিক পক্ষও শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি ফলত শ্রমিকদের ক্ষোভ সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার যে লড়াই শুরু হয়েছিল নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে, সেই আন্দোলনের জোয়ারে হদহদি গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও প্লাবিত হয়েছিল। সত্য, শিখা, নিগমা মন্দিরের নতুন সন্ন্যাসী গোপাল দাস গ্রামের শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলোর মধ্যে সচেতনতা জাগাতে বদ্ধ পরিকর। অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস ও উদ্যম যুগিয়েছে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে। গোপাল দাস এক বিপ্লবী চেতনার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়ে বিদ্রোহের সুর।

> "তোমরা মানুষ? ন্না। মান-হুঁশ, মানুষ। মান সম্পর্কে হুঁশ নেই তোমাদের। তোমরা পরের পা তলে পড়ে আছো। যা পাচ্ছ তা-ই খাচ্ছ, যা দিচ্ছে তাই মেনে নিচ্ছ।...ভাববার হুঁশ কি আর আছে তোমাদের? তোমরা তো কাদায় লেপটে ক্ষীণজীবী কেঁচো হয়ে পড়ে আছো, তোমাদের সব বিষ ওরা ঝেড়ে নিচ্ছে, এবার চুষবে কলা ভেবে, তাও তোমরা পারবে কই?"[১০]

বিদ্রোহ যে একদিন হবেই সে কথা গোবিন্দ মাস্টার অনুমান করে বলেছিল--- ''যা-বল তা-বল হরিহর, ফাটাফাটি একদিন হবে-ই, রুখা যাবে না,''[১১] এবার বুঝি সেই দিন ঘনিয়ে এসেছে। সতীস কাপাড়িয়ার গুদাম লুঠ তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। ভুষিমালের কারবারি তিনকড়ি বাগকে নদীর বালিতে খুন করা হয়। প্রিয় দড়পাটের ঘর পোড়ানো হয়। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে থাকে গ্রামের পরিবেশ।---"ত্রাসের যুগ চলছে চাদ্দিকে, তিনকড়ি ভুষির খুনের পরেও দু-চারটে খুন এদিকে সেদিকে হয়ে গেল। রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে হাত-পা কাঁপে এখন,"[১২]

নকশাল আন্দোলনের অভিঘাত হদহদির নিস্তরঙ্গতাকে আলোড়িত করেছিল। কথকের মনে হয়েছে- 'মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজত্বে শয়তান কোথাও বাসা বেঁধেছে।' যে উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে লক্ষ্যভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়। নিরুদ্দিষ্ট সত্যর চিঠি এ প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। কথককে লেখা প্রথম চিঠিতে সে কেবল জানিয়েছে - ''আমরা যে কাজে ব্রতী আছি, মায়ামমতার স্থান সেখানে নেই, আছে কেবল কঠিন সংকল্প।''[১৩] আর তার লেখা শেষ চিঠিতে ধরা পড়ে সেই সংকল্পের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি। -

> "মণি, এদ্দিনে বুঝেছি চালে কোথাও ভুল থেকে গেছে, ভুলই বটে, মারাত্মক ভুল।... লক্ষ্য আমাদের কির'ম ছিনছাতুর হয়ে যাচ্ছে, ব্যাক্তি স্বার্থের খপ্পরে খুনোখুনিও ঘটছে, এখন ভাবি মাঝপথে না তরী ডুবে।"[১৪]

সত্যর কথায় স্পষ্ট আন্দোলন তার অভিমুখ হারিয়েছে। কঠিন সংকল্পের নামে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ মানুষের আবেগকে। চক্রা মাঝির উপর দায়িত্ব ছিল প্রিয় দড়পাটের ঘর পোড়ানো। চক্রা তার দায়িত্ব পালন করেছে ঠিকই কিন্তু সেও বুঝেছে কোথাও একটা ভুল আছে। অন্তর দহন তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়, যদিও কথকের উপস্থিতিতে তার প্রাণ রক্ষা হয় ঠিকই কিন্তু অন্তরের জ্বালায় সে জ্বলতে থাকে। - "ই-রম জন্ম দিল কেনে বল দেখি? খালি পাপ, পাপ না'লে কি? রাগ চাপল তো আগুন দিলাম পিরাশালার ঘরে, দিয়ে কি সুখ হইল? হইল নাই।"[১৫]

বাঙাল ডাক্তার, ভুবন যে আদর্শ সত্য শিখাদের মধ্যে সঞ্চালিত করে দিতে চেয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের ভুল নেতৃত্বের কারণে। প্রতিবাদ প্রতিরোধ তাই সন্ত্রাসের চেহারা নেয়। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন বিপথগামী হয়। সেই সঙ্গে ভুল পথে চালনা করা হয় আন্দোলনের জোয়ারে মেতে ওঠা সাধারণ মানুষগুলোকেও। দীর্ঘদিন ধরে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত এই মানুষগুলোর অন্তরে জমে থাকা ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কঠিন সংকল্পের নামে হত্যা ও সন্ত্রাস চালিয়েছে তারা। এমনকি কেউ তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলে তাকেও হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেনি তারা। উপন্যাসেও এ ঘটনার সাক্ষ্য মেলে। সত্যকে খুন করা হয়, তার দলের লোকেরাই তাকে খুন করে। সত্য দীর্ঘ সময় ধরে তার দলের হয়ে কাজ করেছে। রিলিফ বাঁধ নির্মাণের সময় সে শ্রমিকদের একত্রিত করে তাকে আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। সর্বোপরি সে তার পরিবারকেও ত্যাগ করেছে। দীর্ঘদিন সে নিরুদ্দিষ্ট, যখন খোঁজ পাওয়া গেল তখন, হদহদির জঙ্গলে তার ধরমুণ্ডু কচু কাটা করে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আসলে সত্যর বাবা ছিল জোতদার এবং অঞ্চল প্রধান।

প্রভাবশালীদের খতম করার যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার আওতায় সত্যর বাবাও ছিল। আর সত্যর উপর দায়িত্ব ছিল পিতৃহত্যার। কিন্তু সত্য সে দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হয়েছে, তাই তাকে মরতে হয়েছে। এই ছিল তাদের দলের নীতি। এইভাবে আরও কত সত্যকে মরতে হয়েছে যার কোনো হদিশ নেই। বাঙাল ডাক্তারের মতো মানুষকেও অপহরণ করা হয়। ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠা সন্ত্রাসের আবহ কথক মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে ক্রমাগত। সর্বক্ষণ মনের মধ্যে আর একটা মন খোঁচা দিতে থাকে। সত্য খুন হওয়ার ঘটনাকে সে কোনো মতেই মেনে নিতে পারেনা।–

> "মনে মনে সত্যর খুন হওয়ার দৃশ্যটা দেখি। তুমি সত্য, ধরো পরম নিশ্চিন্তে কোথাও আসমানের তলে শু'য়ে এখন,...চিন্তায় কদিন ঘুম হয়নি তোমার, আজ শেষ জবাব দিয়ে এসেছ তাই নিশ্চিন্ত। মেলা দূর হেঁটে এসে ধরো ক্লান্ত হ'য়ে তুমি হদহদির জঙ্গলে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লে, কারও ডাকে ঘুম ভাঙ্গল, বিরক্তি ভরা চোখে তুমি তাকালে, গ্রাহ্য না করে ফের শুতে গেলে। তো তাদের ভিতর একজন তোমার সর্বাঙ্গে আলগা হাত বুলিয়ে বলল, ঘুমোচ্ছ? আর একজন এক বিন্দু দেরি না করে তোমার বাঁ কাঁধে অস্তরের কোপ মেরে বলল, তা'লে ভালো করেই ঘুমোও। তুমি কোন মতে বলতে পারলে, মারলে যে? ডান কাঁধে অস্তরের কোপ দিয়ে আর একজন বলল, তুমি কথার খেলাপ কল্লে? দেখতে দেখতে অজস্র আঘাত তোমার সর্বাঙ্গে পড়তে থাকল, জ্ঞান হারালে তুমি, শ্বাস হারালে, শেষতক মরেও গেলে।"[১৬]

সত্যর খুন হওয়া যে কথক মনে প্রবল অশান্তি সৃষ্টি করেছিল তার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা যায় যখন সে সুনির থেকে জানতে চায় সত্যর খুনি কথা।--- ''হারামজাদী, তুই সব জানিস, স-ব! বল কারা সত্যকে খুন করল, বল?''[১৭] কথকের অনুমান সুনিও সত্যর দলের একজন তাই সে সব জানে, কে বা কারা সত্যকে খুন করেছে। গোটা গ্রাম যখন টুসু গানে মত্ত তখন কথক ছুটে গেছে সুনির কাছে। গলা টিপে ধরে জানতে চেয়েছে সত্যর খুনির কথা। সুনি তাঁকে কিছুই জানায় না, একরাশ ক্ষোভ আর বিষাদ নিয়ে সে একাকী ঘুরতে থাকে। সত্যর আগেও অনেকগুলো খুন হতে দেখেছে সে, বিচলিত মনকে কোনো ভাবেই শান্ত করতে পারেনা সে। দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে সে একাকী ছুটে যায় নদীর চরে, হেঁটে চলে জাহাজকানা জঙ্গলের গভীরে। একদিকে অশান্ত পরিবেশ, চারিদিকে হত্যালীলা, অপরদিকে প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা সমগ্র উপন্যাসে এক বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

সন্ত্রাস দমনে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা জঙ্গলমহালকে আরও উত্তপ্ত করেছিল। সি. আর. পি. এফ. মোতায়েন করে সন্ত্রাস দমনের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের আর এক পর্বের সূচনা হয়েছিল। তাদের কাছে জঙ্গলমহালে বসবাসকারী সকল মানুষই অপরাধী তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে তারা অত্যাচার শুরু করেছিল। নারীদের প্রতি ছিল তাদের লোলুপ দৃষ্টি। পুন্নর কথায়--- 'লোকগুলোর বেড়ে খিদা।...মে' পেলে হামলে খায়।''[১৮] রক্ষা করার পরিবর্তে তারাই হয়ে উঠেছে ভক্ষক। তাদের উপস্থিতি মানুষের মনে আর এক ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। যাদের দেখলেই মানুষ আতঙ্কিত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ, স্বাধীনভাবে চলাফেরা এমনকি কথাবলাতেও যেন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। চক্রা কথককে জিজ্ঞাসা করে 'ইসব কেনে মুনিবাপ বল দেখি?' কথক মনে করে 'চাদ্দিকে সন্ত্রাস, পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে এসবের দরকার আছে খুড়া।' কিন্তু খুব অল্প সময়েই কথকের মোহভঙ্গ ঘটে। খুব তাড়াতড়ি পুলিশি সন্ত্রাস বৃহৎ কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। চারিদিকে ধরপাকড় শুরু হয়।

বাড়ির বাইরে পা রাখতেও মানুষের ভয় হয়। এমনকি লাইসেন্স নেই বলে প্রমথ তার সাইকেল মেরামত করা হয় বলে যে সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা পর্যন্ত খুলে রেখেছে। বিষয়টা খুব সামান্য, কিন্তু এই সামান্য বিষয়টাই বলে দেয় সি. আর. পি. এফ এর জওয়ানরা মানুষের মনে কতখানি ভীতি সঞ্চার করেছে। তাদের পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষ্যবহন করে চরণবউ তার শরীরে। ধর্ষণ করা হয় তাকে। চরণ তাকে বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেছিল, 'বহুরে বাইর হয়ো না, তেনাদের বেড়ে খিদা।' চরণের কথা শোনেনি সে, আজন্ম সাহসী স্বাধীনচেতা সে; তাই 'চরণবউ এসময় ক্রোধে আক্রোশে ফেটে পড়ে' প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে। একই ভাবে জ্বলতে থাকে কথক মনও। বাস্তবে এই কলঙ্কিত সময় থেকে মুক্তির কোনো পথ না পেয়ে সমাধানের পথ খুঁজেছেন স্বপ্নের মধ্যে; - " আজকাল খালি সল্যুশানের স্বপ্ন দেখি...ছোটবড় অজস্র সল্যুশান চাদ্দিকে,...দাসবউ বলে, মুনিবাবু, স্বর্গের তালাশ পেলে ত?...স্বর্গের তালাশ পেলে ত মুনিবাবু, পেলে ত?"[১৯] না স্বপ্নের তালাশ বাস্তবে পাওয়া যায় নি তাই একরাশ বিষাদের মধ্যেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'ভাসান' উপন্যাসটি একটি পারিবারিক আবর্তে শুরু হয়ে তা এক দৈশিক প্রেক্ষিতে পর্যবসিত হয়েছে। এক দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনকে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। রচনা করেছেন এক রক্তাক্ত সময়ের দলিল। কথককে লেখা সত্যর চিঠিতে ১৯/২/১৯৭১ এই তারিখ উল্লেখ ছাড়া কোথাও সময়ের উল্লেখমাত্র না করেও ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে সত্তর দশক তথা নকশাল আন্দোলনের এক জীবন্ত দলিল উপস্থাপিত করেছেন। আন্দোলন গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং সেই সঙ্গে আপাত সরল এবং শান্ত গ্রামজীবনে এই আন্দোলন যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এবং তার যে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই সকল বিষয়কে লেখক খুব নিপুণতার সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন। এবং তা হয়ে উঠেছে এক অতিক্রান্ত সময়ের বিশ্বস্ত ছবি।

তথ্যসূত্র:

১। রায় তরুণ, তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি, অনিল আচার্য সম্পাদিত, তিন দশকের গণআন্দোলন, অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা- ১২৪
২। ঐ, পৃষ্ঠা- ১২৯
৩। ঘোষ নির্মল, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১১১
৪। পোদ্দার অরবিন্দ, পশ্চিম বাংলা : রাজনৈতিক বৃত্তে পঞ্চাশ বছর, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণী, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা – ১৮৫
৫। বদরুদ্দিন উমর, সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন, অনিল আচার্য সম্পাদিত, সত্তর দশক - খণ্ড এক, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা – ৬৯
৬। নলিনী বেরা, ভাসান, দুই ভুবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৫, পৃষ্ঠা – ৩৪
৭। তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৭
৮। তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৯
৯। তদেব, পৃষ্ঠা -৫০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা – ৭৬
১১। তদেব, পৃষ্ঠা – ৫১
১২। তদেব, পৃষ্ঠা – ৯২
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ৭২
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ৯৭
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ৯৭
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা – ১১৫
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা – ১১৭
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা – ১০৭
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা – ১১৩